শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(চতুর্থ কিস্তি)

মিল্টনের মেজো খালা রেহানা গতকাল ঢাকা থেকে বরিশাল এসে পৌঁচেছেন। ঢাকা থেকে তাঁরা প্রথমে বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কেরানিগঞ্জে আসে। সেখান থেকে কখনো রিক্সায়, কখনো ভ্যানে করে তিন দিনে ফরিদপুর এসে পৌঁছায়। একই ভাবে যেখান থেকে দুই দিন শেষে বরিশাল এসে পৌছাল। কয়েকদিন এখানে থেকে সুবিধামত সময়ে পটুয়াখালি যাবে।

মিল্টন খেয়াল করল, খালা, খালুর পা ফুলে গেছে। গায়ের রং পুড়ে কালচে হয়ে গেছে। তাঁদের এক মাত্র ছেলে অনিক সেই তুলনায় অবশ্য ভাল । ওর বয়স ১৩/১৪ হবে। বয়সের তুলনায় শরীর আরও সুগঠিত।

খালা, খালু ও অনিক পরপর দুই দিন ঘুমাল। মিল্টনের মামা ভয় পেয়ে বন্ধুর এক ডাক্তার ছেলেকে বাসায় নিয়ে এলো একদিন। ওদের শরীর ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা দরকার। পাঁচ

দিনের লাগাতার হাঁটাহাঁটির পরিণাম কী হয়েছে, অবশ্যই জানা দরকার। ছেলেটি সবাইকে পরীক্ষা করে দেখলো, না। কারো কোন সমস্যা নেই। তবে, আরো বিশ্রাম নিতে হবে।

পুরো এক সপ্তাহ লাগল মিল্টনের খালাদের সুস্থ হয়ে উঠতে। পায়ের ফুলাটা একদম নাই। শরীরে ব্যাথাও চলে গেছে। এই অবস্থায় মিল্টনের মামা খালেক সাহেব তাঁর ভগ্নিপতি আবিদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন ঢাকার কথা। আবিদ সাহেব স্মরণ করতে লাগলেন তাঁদের জীবনের সবচেয়ে কষ্টের স্মৃতি।

২৫ মার্চ রাতে আবিদ রাজারবার্গ পুলিশ ক্যাম্পে ডিউটিতে ছিলেন। রাত নয়টার দিকে চতুর্দিক থেকে ঘরঘর আওয়াজ শুনতে পেলেন। কিছুক্ষণ পর গুলির আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। হঠাৎ করে গগণবিদারি আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। সহকর্মীদের কেউ কেউ চিৎকার করে বলতে লাগল, ট্যাংক আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এরপর শুরু হলো ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ।

আবিদ দেখল, চোখের সামনে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে বড় বড় গর্ত হয়ে যাচ্ছে। তার মত যারা ডিউটিতে, সবাই যে দিকে পারে, পালাচ্ছে। বাঁচতে হলে তাই করা উচিত তো। আবিদ দৌড়ে এসে পশ্চিম দিকের খোলা জায়গায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে ক্রলিং করে এগুতে থাকে পাশের বাড়িগুলোর দিকে।

হঠাৎ আগুন দেখা গেল মুল ভবনের দিকে। আত্মচিৎকারে ভেসে যাচ্ছিল চারদিক। আবিদ দেখল, তার পাশে হাসান নামে পূর্ব পরিচিত একজন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওপাশে আরো দুই জন।

আবিদ মরার মতো পড়ে থাকল। কতক্ষণ কে জানে! আগুন এক সময় কমে আসলো। গুলির শব্দও থেমে আসল। খুব আশ্চর্য লাগছিল যে, সে এখনো বেঁচে আছে।

দূরে এক সময় আযানের শব্দ শোনা গেল। হালকা আলোতে দেখা যাচ্ছে, সারি সারি মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাথা তুলে তাকালো রাস্তার দিকে। গুলির শব্দ আর নেই। ধোঁয়া উড়ছে চতুর্দিকে। আবিদ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে রাস্তায় চলে আসল। না রাস্তায় কেউ নেই। ওই রাস্তা থেকে পাশের দূরবর্তী একটি গলিতে ঢুকল আবিদ। না কেউ নেই সেখানে। এরপর বড় রাস্তা পার হয়ে আরামবাগের ভিতরে ঢুকে পড়লো। বড় রাস্তায় ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। আরামবাগে বাসা আবিদদের। বাসায় ঢুঁকে জ্ঞান হারাল আবিদ।

এক বিকেলে ফিরোজ ফাহিমদের ডাকল। কেন ওরা কেউ কিছু অনুমান করতে পারলনা। ভূমিকার মত করে ফিরোজ ওদেরকে প্রথমে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বললেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমরা সবাই কি মুক্তিযুদ্ধ করছি?

সবাই বলল, না। আমরা সবাই করছি না।

-তাহলে আমাদের কি কিছু করা উচিত ?

-হ্যাঁ, অবশ্যই করা উচিত। খোকন বলল, কিন্তু আমরা কি করব ? আমরা তো ছোট। আমাদের তো যুদ্ধে নেবে না। আব্বু-আম্মুও আমাদেরকে যেতে দেবে না। তাহলে উপায় ?

-উপায় আছে বললেন, ফিরোজ ভাই।

-মিল্টন বলল, কিভাবে ?

-আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেও যুদ্ধে অবদান করতে পারি।

-মনা বললো, কিভাবে ?

-আমরা শহরে আছি। তোমরা কি জানো এই শহরেও মুক্তিযোদ্ধারা কাজ শুরু করে দিয়েছে। সবাই এক যোগে বলল, না তো।

-আমাদের চোখ কান সজাগ রাখতে হবে। যদি এমন কিছু আমরা দেখি কিংবা শুনি যা মুক্তিযোদ্ধারা জানলে তাদের জন্য সুবিধা হয়, আমাদের কি উচিত হবে না সেগুলো তাদেরকে জানানো ?

-নিশ্চয়ই।

-তোমরা এখন শোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। গুঞ্জণ শোনা যাচ্ছে, শহরের কিছু বাঙালিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য দেবে মিলিটারিদের। যাতে বাঙালিরা যুদ্ধে জিততে না পারে।

-কারা তারা, মিল্টন জানতে চাইলো।

-আমরা এখনো জানি না। তবে তাঁদের একজন হলেন রব উকিল। তোমরা উনার বাসা চেন না ?

-হ্যাঁ চিনি। ফাহিম বলল। আমরা উনার ছোট ছেলের সাথে মাঝে মাঝে ক্রিকেট-ফুটবল খেলি।

-তোমাদের দায়িত্ব হবে প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে বিএম স্কুলের মাঠে ক্রিকেট খেলবে। তোমরা খেয়াল করবে, কারা ওই বাসায় যায়। যদি অস্বাভাবিক কিছু দেখো, তবে আমাকে জানাবে। ঠিক আছে?

-ঠিক আছে। আমরা তো এমনিতেই প্রতিদিন মাঠে যাই খেলতে। কোন অসুবিধা হবে না। এটি করতে পারবো।

ফিরোজ এবার বলল, তোমরা মাঝে মাঝে স্বপনদের বাসায় যাবে। ওর ঠাকুর মার খোঁজ-খবর নিবে। পারবে না ?

-পারবো। বাদল বলল।

-আর একটি ব্যাপার। এখন তোমাদের সাথে যা আলাপ হল, এটি কাউকে বলবে না। বলবে ?

-না।

স্কুল থেকে ফিরে ওরা সবাই বিএম স্কুলের মাঠে খেলতে গেল। মিল্টনের হাতে একটি ফুটবল। ওরা রব উকিলের বাসার কাছের একটি অংশে স্যান্ডেল দিয়ে গোলবার বানিয়ে খেলা শুরু করল। খেলার এক পর্যায়ে উকিল সাহেবের ছোট ছেলে আসল।

ফাহিম জিজ্ঞেস করলো, আরিফ ভাই, খেলবেন ?

-খেলবো, তবে তোমাদের অসুবিধা হবে না তো ?

-না। বরং আমাদের আরো প্লেয়ার হলে ভালো হয়।

সন্ধ্যার আগে আগে যখন মিল্টনরা বাসায় ফিরবে, কয়েকটা মিলিটারির গাড়ি এসে উকিল সাহেবের বাসার সামনে দাঁড়ালো। মিলিটারিরা গাড়ি থেকে নেমে উকিল সাহেবের বাসায় ঢুকল। আরিফকে একটু চিন্তিত মনে হলো। ফাহিমরা বাসার দিকে রওনা দিল। তবে যাবার আগে ফিরোজ ভাইকে জানিয়ে গেছে, তারা যা দেখেছে।

ফাহিমদের সঙ্গে আরিফ অনেক সহজ হয়ে গেছে। অনেক বিষয়ে আলাপ হয় ওদের মধ্যে। আরিফ তখন অনেক কথা বলে। একদিন বাদল দেখলো, কিছু মানুষ রিক্সা থেকে নেমে আরিফদের বাসায় প্রবেশ করছে। এরা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ হবে। চেহারায় অভিজাত ভাব।

মিল্টন আরিফ ভাইকে জিজ্ঞেস করলো- এঁরা কারা।

-উনারা বাবার উকিল বন্ধু। আমিও সবাইকে চিনি না। তবে সবার আগে যিনি ঢুঁকলেন, উনি রহমান বিশ্বাস চাচা।

-কী, কোন পার্টি আছে নাকি আপনাদের বাসায় ?

-না না, সে রকম কিছু না। বাবাকে মিলিটারিরা দায়িত্ব দিয়েছে পিচ কমিটি করার জন্য। তার জন্যই মনে হয় এসেছে, আলোচনা করতে।

-পিচ কমিটি কী?

-শহরের মানুষ যাতে ভাল থাকে, উনারা তার জন্য কাজ করবে। সাধারন মানুষের হয়ে মিলিটারির সাথে যোগাযোগ রাখবে।

-ও, শুধু এই?

-না, আরো আছে। ভারতীয় চরদের সংবাদ যদি এঁরা পায়, সেই সংবাদও মিলিটারির কাছে দিবে।

-আর মুক্তিবাহিনীর কথা জানলে কি করবে?

আরিফ হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। এ কথার জবাব দিলো না। ফাহিমরা মহল্লায় ফিরে এলো। ফিরোজ ভাইকে জানালো, আজ কী দেখেছে।

এক বিকেলে ফাহিমরা স্বপনদার ঠাকুর মা'র খোঁজ নিতে গেলো। হাঁক-ডাক দিতে দিতে ওরা ভেতরে প্রবেশ করলো। না, কোন সাড়া নেই। কী ব্যাপার, বুড়ি পটল তুললো না তো ?

ভেতরের ঘরে শুয়ে আছে ঠাকুর মা। চোখের পাতা ফোলা ফোলা। চোখ খুলে আবার বন্ধ করলো। ওদের দেখেও কোন কথা বলছে না। অসুস্থ না তো ? ফাহিম কপালে হাত দিয়ে দেখলো, ভীষণ জ্বর শরীরে। কে দেখছে উনাকে ? একা একা তো মারা যাবে। এমন সময় দরজা ঠেলে একটি মেয়ে ঘরে ঢুঁকলো। মেয়েটির বয়স ষোল-সতের হবে। জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা ?

-আমরা মহল্লার ছেলে। আপনাকে চিনতে পারলাম না তো ?

-আমরা সামনের বাসায় ভাড়া থাকি। স্বপনদা বলে গেছেন ঠাকুর মা'র খবর নিতে। তাই মাঝে মাঝে আসি।

-উনার তো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওষুধ কি কিছু দিয়েছেন ?

-প্যারাসিটামল দিয়েছি। ডাক্তার দেখালে ভালো হতো। তোমরা একটু দেখো না, কোন ডাক্তার আনতে পারো কিনা ?

-দেখি। বাদল বললো।

ওরা গলির মাথায় একজন হোমিও ডাক্তার পেল। সব শুনে তিনি রাজি হলেন আসতে। বললেন, চেম্বারে দু'জন রোগী আছে। তাঁদের দেখে তোমাদের সঙ্গে যাবো।

বাদলরা ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে এল। ডাক্তার সাহেব ঠাকুর মাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। তবে জ্বর মাপতে হবে বারবার। জ্বর বেশি দেখলে মানে নিরানব্বই এর চেয়ে বেশি হলে, গা মুছে দিতে হবে ভিজা গামছা দিয়ে। ঘরে থার্মোমিটার আছে?

প্রতিবেশী সেই মেয়েটি বললো, আছে।

-ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই। কাল জানিও কেমন অবস্থা। যদি কাশি শুরু হয়, তাও জানিও।

-ঠিক আছে। মেয়েটি বললো।

ডাক্তার চলে গেল। ফাহিম বললো, আপু, আমরা যাই তাহলে।

-আচ্ছা। কাল এসো কিন্তু। মেয়েটি বললো। ও হ্যাঁ, আমার নাম শিরিন। আমাকে শিরিন আপা বলে ডাকতে পারো।

-আচ্ছা। বাদলরা মাথা নাড়লো। এরপর ওরা যে যার বাসায় চলে গেল।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক